অচিন মানুষ

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

(এক)

অজয় লটারীর টিকিট বিক্রেতা।

পুলিশ থানার গায়ে শনি মন্দিরের পিছনে ছোট তেকোণা মতো একটু জায়গা। সেখানে কাঠের টুলে বসে অজয় টিকিট বিক্রি করে। কোন আচ্ছাদন নেই। মন্দিরের দেওয়ালে দড়ি খাটিয়ে টিকিট ঝুলিয়ে রাখে। চায়ের পেটি দিয়ে তৈরী ছোট একটি টেবিল। তার ওপর টিনের ক্যাশ বাক্স। সাদা কাগজের খাম। 'দৈনিক লটারী সংবাদ'-র প্রতিদিনের সংখ্যা। পুরোনো কয়েকটি সংখ্যাও থাকে। অনেক খদ্দের হয়নি জেনেও, নিখুঁতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরনো রেজাল্ট দেখে। নিজের কেনা টিকিটের সঙ্গে মেলায়। কখনও কখনও 'ইস্' বলে হাতে ধরা টিকিটটি রেজাল্ট সিটের গায়ে সেঁটে ধরে।

এই মুহূর্তগুলি অজয়ের চেনা। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এম সিরিজের শেষ তিনটে সংখ্যা কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। মন খারাপ করবেন না। সিকিম বাম্পারের টিকিট দিচ্ছি। প্রতি সিরিজে প্রথম কিম্বা শেষ দুটো সংখ্যা লাগাতে পারলেই কেল্লা ফতে।

ক্রেতা হয়ত তখনও শোকটুকু সামলে উঠতে পারেনি। রাগত গলায় বলে, খাদনের মোড়ে 'সুবর্ণলতা'-য় আজও দেখলাম ফুলের মালা ঝুলছে।

অজয় হেসে বলে, নান্টুর কথা বলছেন তো? ওর অনেক গোলমেলে ব্যাপার আছে।

— মানে?

— যে নম্বরে লেগেছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেই সিরিজের টিকিটই ও বিক্রি করেনি।

— তাই কখনও হয়?

— না হওয়ার কি আছে? ওর ভায়রাভাই হোল সেলার। শ্যাওড়াফুলি স্টেশনের গায়েই 'গণেশ লটারী সেন্টার।' তাদের উইনারের নম্বর আলতা দিয়ে লিখে, তার ওপর বাসি গাঁদার মালা চড়িয়ে দিল। কে পেয়েছে, কোথাকার লোক, কিছুতেই বলবে না। জোরাজুরি করলে বলবে, এসব ট্রেড সিক্রেট। লোকটার বিপদ হলে আপনি বাঁচাবেন? এমন অ্যাকটিং করবে, আপনি ঘাবড়ে যাবেন। ভাববেন তাই তো, লোকটার বিপদ হলে আপনি বাঁচাতে পারবেন না।

অজয় জানে, লটারীর খদ্দেররা যেমন টিকিট জেতার ব্যাপারে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকে,

আবার জিতে যাওয়া অর্থের সবটুকু ঘরে নিয়ে যেতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ঘোর সংশয়েও থাকে। খবর একবার চাউর হয়ে গেলে, কত রকমের বদলোক যে এসে চারপাশে জড়ো হবে! গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাবে। একটু এদিক ওদিক হলে হাবে মুলাদে শেষ হয়ে যাবে। কাঁদবার ফুরসতটুকুও পাবে না।

(দুই)

নিত্যপূজারী গোরাচাঁদ গঙ্গাজলের ছিটে, তার সঙ্গে আস্ত একটি জবাফুল অজয়ের ক্যাশবাক্সের ওপরে রাখে। গোরাচাঁদের দৈনিক বরাদ্দ এক টাকা। খ্যানখেনে সুরে রোজ একই কথা বলে, দক্ষিণেটা একটু বাড়াও অজয়দা।

অজয় গম্ভীর গলায় বলে, না পোষালে ছেড়ে দে। বাজারে পুজুরী বামুনের অভাব নেই।

— এটা একটা উত্তর হলো? গোরাচাঁদ অভিমানী গলায় বলে, তুমি শুধু ফুল ফেলাটুকু দেখলে? তোমার ব্যবসার উন্নতির জন্য ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করি জানো?

— আমি তো শুনতে পাই না!

— পাবে কি করে? মনে মনে তো বলি।

— জোরে জোরে বল একটু।

— সংস্কৃত মন্ত্র তুমি বুঝবে? তুমি যাদের কথা বলছো, ওইসব মন্ত্র উচ্চারণ করতে তাদের দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

অজয় হেসে ফেলে, মন্ত্রের যদি এতই জোর তো নিজের ভালর জন্যে আওড়াতে পারিস।

— পারি তো। বলে একটু থামে গোরাচাঁদ। তারপর ফিক করে হেসে বলে, দেখেশুনে একটা টিকিট দাও না গুরু। অবস্থা খুব টাইট। বাজারটা তো পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে। তাল রাখতে পারছি না।

অজয় মাঝে মধ্যেই গোরাচাঁদকে লটারীর টিকিট দেয়। দাম নেয় না। মনে মনে ভাবে, গোরাচাঁদের মন্ত্রের জোরে যদি মিরাকেল কিছু ঘটে যায়! গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তার কপালও তো খুলে যাবে। গোরাচাঁদের মতো তারও টাইট অবস্থা।

পুলিস থানার মেজোবাবু যিনি থানার গায়ে অজয়কে বসতে দেওয়ার জন্য, মাসে দুশোটি করে টাকা নেন গোপনে, তিনিও প্রায়ই বলেন,

দু নম্বরি টিকিট বেচছিস না তো?

অজয় চমকে ওঠে, কই? না তো।

— তাহলে? নমাসে ছমাসে একটা দুটো লাগে না কেন?

— কি করি বলুন তো? অজয় বিষণ্ণ গলায় বলে, বেছেবুছে টিকিট নিয়ে আসি। লটারী মানেই ভাগ্য। এটা তো মানেন।

— শুধু ভাগ্য বললেই হবে? তোর হাতযশ কি?

হাতযশ! অজয়ের সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায়। লটারীর টিকিট বিক্রির সঙ্গে হাতযশের সম্পর্ক কি!

— পোড়া কপাল। অজয় বলে, কি আর করব বলুন?

— তাই বল। মেজোবাবু ঘাড় দুলিয়ে এমনভাবে বলেন যেন অজয় মেজোবাবুর হাতে ধরাপড়া আসামী, সত্যি কথাটি বলে তার অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে।

— পুজো বাম্পার তুলেছিস? মেজোবাবু জিজ্ঞেস করেন, এবারের খেলা তো আমাদের এখানে। রবীন্দ্রভবনে।

— শুনছিলাম। অজয় আস্তে করে বলে।

— তুই তো শুনেই খালাস। আমার এদিকে কেলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। ৪ঠা অক্টোবর খেলা। ল অ্যান্ড অর্ডারের পুরো দায়িত্ব আমার। এস.পি. ফাইলে আমার নাম রেকমেন্ড করেছে। তাই নিয়ে বড়বাবুর কি গা জ্বলুনী। খবরটা লিক আউট করবি না।

অজয় ঘাড় নাড়ে, কখখনো নয়।

— দেখেশুনে একটা টিকিট রাখবি। তারপর যদি অঘটন কিছু ঘটে যায়। উত্তেজনায় মেজোবাবুর দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, আমার নামটা কিন্তু গোপন রাখবি। নেড়িকুত্তার দল। সবাই মিলে আমায় ছিঁড়ে খাবে। তারপর সরকারী চাকরি করি কিনা, ইনকাম ট্যাক্স, অ্যাসেস স্টেটমেন্ট এসবের ঝামেলা আছে। বলা যায় না, কোন বানচোৎ হয়ত গায়ের ঝালে ভিজিলেন্স ঠুকে দিল।

অজয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। পুজো বাম্পারের একটা টিকিটের দাম কুড়ি টাকা। মেজোবাবু মুখে একখানা টিকিটের কথা বললেও, এ সিরিজ ও সিরিজ মিলিয়ে নেবে অন্তত খান দশেক। মাসকাবারি দুশো টাকার সঙ্গে এই টিকিটগুলির দামের অ্যাডজাসমেন্টের কোন গল্পই নেই।

(তিন)

প্রতিদিনের মতো আজও অজয় টিকিট সাজিয়ে গুছিয়ে কাঠের টুলটিতে বসেছিল।

ষষ্ঠীর দোকানের অল্পবয়সী কর্মচারীটি তাকে চা বিস্কুট দিয়ে গেছে। গোরাচাঁদের নিত্য সেবার টাটকা জবাটি কপালে ছুঁইয়ে দড়িতে টাঙানো টিকিটের পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রোজ যেমন দেয়। বিমলের সেলুন থেকে দৈনিক খবরের কাগজটি চেয়ে এনে খেলার পাতাটি পড়ছিল মন দিয়ে।

দিনের শুরুতে এই সময়টায় অজয় হালকা মুডে থাকে। অনেকদিনই অবিবাহিত ছোট বোন মিঠুর বিয়ে, নিজের ঘরসংসার, বৃদ্ধা মাকে কাশী বৃন্দাবন ঘুরিয়ে আনা, এমনি সব বিষয় অজয়ের ভাবনার মধ্যে উঠে আসে এবং সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে ঘাড় তুলে কোন ক্রেতাকে লটারীর টিকিট বাছতে দেখলে, উঠে দাঁড়াবার তাগিদ বোধ করে না। রেজাল্টের বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, নিস্পৃহভাবে 'লটারী সংবাদ'-এর সংখ্যাটি এগিয়ে দেয়।

মিঠুর বিয়ের ব্যাপারে গত সপ্তাহে বড়মামা ফোন করেছিলেন। ভাল একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকারী চাকরী। ভাটপাড়ায় নিজস্ব বাড়ি। অজয় বলেছে, যোগাযোগ করতে পারো। তবে মেয়ে দেখার আগে দেনাপাওনার ব্যাপারটা জেনে নেবে।

— ঠিক আছ। বলে বড়মামা হেসে বলেছিলেন, মিঠুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেই তোর একট হিল্লে করতে হবে। দিদির বয়স হয়েছে। সংসারের হাল তো একজনকে ধরতে হবে, নাকি?

— সে দেখা যাবেখন। অজয় ফোন রেখে দিয়েছিল।

বড়মামার আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও, আন্তরিকতা আছে। নিয়মিত খোঁজখবর নেয়। অজয়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে।

টুলে বসে অজয় বড়মামার সেদিনের কথাগুলি ভাবছিল। যে কোন আনন্দদায়ক ভাবনায় মুহূর্তের জন্য হলেও মানুষ আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তখন তার চোখ বুজে আসে আপনিই এবং বন্ধ চোখের পাতায় টুকরো টুকরো কাল্পনিক কিছু ছবি হেঁটে বেড়ায়। হাসে। অসম্পূর্ণ বাক্যে কথা বলে।

এমনি একটি সেমিতন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে ছিল অজয়। টুলের ওপরে বসে। বাঁ হাতটি টেবিলে রাখা। হাতের করতলে হেলানো মাথাটি আল্তোভাবে ধরা।

আচমকা রিনরিনে গলায় কে যেন ডাকল, এই যে, শুনছেন?

অজয়ের মনে হল, বড়মামা যেমনটি বলেছে তাকে, মিঠুর বিয়ের পর ..., দিদির বয়স হয়েছে..., সংসারের হাল ধরার জন্য ..., মহিলা কণ্ঠস্বরটি যেন সেই অনাগত নারীর, বড়মামার কথামত অজয়ের সুস্থিতির জন্য যার আগমন একান্ত অনিবার্য।

— শুনছেন?

দ্বিতীয়বার ডাকের পর অজয়ের ঘোর ঘোর ভাবটা কেটে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল।

রোগা চেহারা। শ্যামলা গায়ের রং। তাঁতের ছাপা শাড়ি পরনে এক কিশোরী, কালো

একটি পার্স বাঁ হাতে ধরে, হাতটি আল্তো ফেলে রেখেছে বুকের ওপর। অনুচ্চারিত হাসির কারণেই বন্ধ দু ঠোঁট সামান্য ফুলে উঠেছে।

অজয় ভাবল, তার মুহূর্তের আনমনার সুযোগ নিয়ে কিশোরীটি তাকে নিয়ে মজা করছে।

— কি চাই বলুন? অজয় জিজ্ঞেস করল।

— টিকিট। হেসে জবাব দিল কিশোরী, টিকিট ছাড়া আরও কিছু পাওয়া যায়?

— টিকিট লাগলে, টাকা পাওয়া যায়।

— কে পায়?

— যার টিকিট লাগে।

— আপনিও তো পান।

— আমি?

— কমিশন পান না?

— আপনি তো অনেক কিছু জানেন। একটু থেমে অজয় বলল, আপনারও বুঝি এই ব্যবসা?

— লটারির টিকিট বিক্রি? কিশোরী চমকে ওঠে, অত বুদ্ধি আমার নেই।

অজয় হেসে ফেলে, টিকিট বিক্রি করতে আবার বুদ্ধি লাগে নাকি?

— লাগে না? কি বলছেন? সিরিজের হিসেব রাখা। কোন টিকিটের বাজার ভাল। যারা কেনে, তাদের কে কোনটা পছন্দ করে, সেসব মনে রাখা! বাবা!

— একটু সময় লাগে। অজয় তার পেশার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে, মন দিয়ে শিখলে শেখা যায়। তার সঙ্গে একটু ধৈর্যেরও দরকার।

— আমি তো তাই বলছি। কিশোরী বলে, মন দিতে হবে। তার সঙ্গে আবার ধৈর্য ধরতে হবে। অত হ্যাপা পোষায় না।

— হ্যাপা ভাবলেই হ্যাপা। অজয় লম্বা করে শ্বাস ফেলে, যে কোন কাজেই ওই দুটো খুব দরকার। মন আর ধৈর্য।

— বুঝেছি। বুঝেছি।

— ছাই বুঝেছেন।

— তাহলে তাই। কিশোরী ফিক করে হেসে ফেলে, একদিনে কি সব বোঝা যায়?

— আপনাকে আমি কিছুই বোঝাতে চাইনি। অজয় দুহাত নেড়ে বলে, কোন টিকিট দোব বলুন?

— যেটা লাগবে। টাকা পাবো।

— সে কি করে বলি? লাগা না লাগা আপনার ভাগ্যের ব্যাপার।

— শুধুই আমার ভাগ্য! আপনি যে হাতে করে দিচ্ছেন!

— তো? কি হল?

— হাতের গুণ নেই বুঝি?

অজয় চমকে ওঠে। মেয়েটি বলে কি? হাতের গুণ! তার মানে থানার মেজোবাবু যাকে বলে হাতযশ!

— দেখুন! অজয় গলাটাকে একটু ভারি করে বলে, হাতের গুণে যদি ভাগ্য খুলে যেত, তাহলে তো টিকিট বিক্রি করে পেট চালাতে হোত না। দুচারখানা লাগিয়ে দিয়ে কোটিপতি হয়ে বসে থাকতাম।

— আমি কিন্তু অত সিরিয়াসলি বলিনি।

— ঠিক আছে। অজয় হেসে ফেলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টিকিট কেনার ব্যাপারে কিশোরীকে দুচার কথা বলতেই হল অজয়কে। সাকুল্যে চারটি টিকিট কিনল কিশোরী। দাম দেবে বলে পার্সের চেন টানতে গিয়ে থমকে গেল, আমি কিন্তু একটা একশ টাকার নোট দোব। ভাঙ্গানি হবে?

— উঁহু। অজয় ঘাড় নাড়ে, হবে না।

— তাহলে? কিশোরীর চোখমুখে চিন্তার ভাঁজ, আশপাশের দোকানে ভাঙ্গানি পাওয়া যাবে না?

— মনে হয় না। সবাই তো আমার মতোই সবে স্টার্ট করেছে।

— কি করা যায় বলুন তো? কিশোরী হতাশ গলায় বলে, ভাগ্যের খেলায় গোড়াতেই মন্দ ভাগ্য। টিকিটগুলো রাখুন।

— রেখে দোব? অজয় ইতস্তত করে, আপনি না হয় একটু ঘুরে আসবেন?

— সম্ভব নয়। রেখে দিন। অন্য কোন সময়ে এ রাস্তায় গেলে, তখন না হয় ...!

— দ্যাটস এ গ্রেট আইডিয়া। অজয় আঙ্গুলে আঙ্গুল ঘষে টুসকি বাজায়, অন্য যে কোন সময়ে এসে দামটা দিয়ে যাবেন। উপস্থিত খুচরো যা আছে, সেটুকু দিন। বউনি কিনা!

— আপনি আমায় বিশ্বাস করে টিকিটগুলো দিয়ে দিচ্ছেন?

— হ্যাঁ। পূর্ণ বিশ্বাসে দিচ্ছি। কারণ আমি অনেক বছর ব্যবসা করছি। খদ্দের চিনি।

কিশোরী পার্স খুলে একটি দু টাকার কয়েন ক্যাশ বাক্সের ওপর রাখল। টিকিটভরা সাদা খামটি শাড়ির আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের ফাঁকে ভরে নিল।

কিশোরীর চলার পথের পানে অজয়কে চেয়ে থাকতে দেখে পান বিড়ির দোকানী বিশ্বনাথ বলল, মোক্ষম খদ্দেরের পাল্লায় পড়েছিলে।

অজয় বলল, কেন?

— কেন আবার! ফ্রীতে উপদেশ। ধারে জিনিস।

— ও, তাই! অজয় হাসল, সুযোগ পেলে জ্ঞান দিতে কে ছাড়ে বল? একটু চুপ করে থেকে বলল, উপায় ছিল না, তাই বাকিতে দিতে হল। তবে মার যাবে না।

— না গেলেই ভাল। লম্বা করে টেনে বলল বিশ্বনাথ।

অজয় কোন জবাব দিল না। যদিও সে জানে, এই আলোচনাটা আরও কিছুক্ষণ চলুক, বিশ্বনাথের ইচ্ছেটা তেমনই। কারণ এই জাতীয় মুখরোচক আলোচনা কতদূর পর্যন্ত গড়ালে তা শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে পারে, সেসম্পর্কে কোন বিধিবদ্ধ হুঁশিয়ারী নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা অজয়ের রুচিবিরুদ্ধ।

(চার)

অজয় বলেছিল 'যে কোন সময়ে', কিশোরী কিন্তু তার পরদিনই এসে বাকি টাকা দিয়ে গেল। আবার নতুন দুটি টিকিটও কিনল।

কিশোরীটির নাম শম্পা। ধরমপুর অঞ্চলে বাড়ি। বাবা নেই। মা মেয়ে আর একটি ছোট ভাই। তিনজনের সংসার। ধরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহায়িকা শিক্ষিকা। মাইনে বলার মতো নয়। চাকরিটিও কোনদিনই পাকা হবে না। প্রাইভেট টিউশন আর বিদ্যালয়ের সামান্য মাইনে, এই দুইয়ে মিলিয়ে সংসার চলে। বাবা চটকলের শ্রমিক ছিলেন। অকালে মারা গেছেন। কর্মস্থলের টাকা যেটুকু পাওয়া গেছিল, বাবার চিকিৎসাতেই তা শেষ হয়ে গেছে।

— ক্যান্সারের চিকিৎসার খরচ নেই বলুন? অথচ মানুষটা বাঁচবে না জেনেও ...!

— ঠিক কথা। অজয় সমবেদনা জানায়। হবে না জেনেও তো অনেক কিছুই করে যেতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই। চিকিৎসা না করালে অনেক বেশী কষ্ট পেতেন। নিজের বিবেকের সঙ্গে সারা জীবন লড়াই করতে হোত।

— আপনি তো বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পারেন। শম্পা বলে, বাংলার টিচার হলে পপুলার হতেন।

অজয় লজ্জা পায়, কি যে বলেন! একটু থেমে বলে, পেশা হিসাবে মাস্টারী কিন্তু খুব সম্মানের। এই যে আপনি একজন দিদিমণি, আমার মতো একজন লটারীওলার সঙ্গে প্রিয়জনের মতো করে সুখ দুঃখের গল্প করছেন, ভাবতে পারেন, এটা আমার কত বড় পাওনা!

— তাই নাকি? ভ্রূ নাচিয়ে শম্পা বলে, আমিই বুঝি আপনার একমাত্র খদ্দের, পেশায় যিনি সহায়িকা শিক্ষিকা?

— না। তা কেন? সব পেশার মানুষই টিকিট কেনে। তারা কেউই কিন্তু আমাকে লটারীওলার বেশী কিছু ভাবে না। প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও বলে না।

— আপনিও বলবেন না। তবে হ্যাঁ, আমি আবার একটু বেশী কথা বলি বলে, আমাকে বাচাল ভাববেন না।

— তা কেন? আমি কথা বলছি বলেই না আপনি বলছেন। আমি যদি চুপ করে থাকতাম, আপনি একা বকবক করতেন না।

— ধরুন যদি তেমনটাই হোত?

— লোকে আপনাকে পাগল ভাবত।

— ইস! কথা বলারও কত বিড়ম্বনা। তাই না?

— মোটেও না। কথা কইতে জানত হয়।

— জানি মশাই জানি। কথা ষোল ধারায় বয়।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। পথচলতি কয়েকজন তাকায়। থানার একজন কনস্টেবল অফ ডিউটিতে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে পানবিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের ইশারায় বেশ উঁচু গলায় অজয়কে জিজ্ঞেস করল, কোন সুখবর আছে নাকি?

অজয় দ্রুত জবাব দিল, না। না।

শম্পা বলল, আজ চলি।

উল্টোমুখো হয়ে শম্পা হাঁটতে শুরু করল। অজয় তাকে ডাকতে গিয়েও চুপ করে গেল।

(পাঁচ)

অজয়ের বোন মিঠু একদিন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে দাদা, একটা মেয়ে তোর কাছে লটারীর টিকিট কিনতে আসে?

অজয় বলল, একটা কেন? অনেক মেয়েই আসে।

— আমি ওই মেয়েটাকে চিনি। ওর নাম শম্পা। ধরমপুর স্কুলে পড়ায়। ওই দিকেই থাকে।

অজয় চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য অল্প একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, কার কি নাম, পেশা, তাতে আমার কি?

— তুই না কেমন যেন!

— কেন?

— রেগুলার কাস্টমারের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় না?

— আলাপ করার মতো অত সময় আমার নেই।

— এর মধ্যে দোষেরও কিছু নেই। মিঠু বলল, এতে ব্যবসার গুডউইল বাড়ে। একজন ভাল খদ্দের রেফার করলে, দশজন নতুন খদ্দের আসে।

— তোর কম্বিনেশন কি যেন? হিস্ট্রি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স। তাই তো?

— হ্যাঁ। তাই।

— এমন কথা বলছিস, যেন তুই এম.বি.এ.-র ছাত্রী।

— মোটেও না। মিঠু হেসে ঘাড় নাড়ে, একটা সামান্য ব্যাপার জানার জন্যে এম.বি.এ. হতে হয় না।

আড়চোখে মিঠুকে দেখে অজয়। শাড়িতে ফলস্ পাড় বসাচ্ছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে কথাগুলি ছুঁড়ে দিচ্ছে, যেন এগুলি নিছকই কথার কথা। এর মধ্যে মিঠুর কোনরকম বাড়তি কৌতুহল নেই।

অজয়ের বাবা নেই। কর্মসূত্রে দাদা নাগপুরে থাকে। সেখানে সে স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখেই আছে। বিধবা মা, বেকার ভাই এবং অবিবাহিত বোনের কোন খবরই রাখে না। ছুটিছাটায় সাহাগঞ্জে শ্বশুর বাড়িতে এসে ওঠে। নিজের বাড়ির কথা তার মনেই পড়ে না। মায়ের সামান্য ফ্যামিলি পেনসন আর অজয়ের লটারীর ব্যবসার টাকায় কোনরকমে সংসার চলে। তার মধ্যেও অজয় মিঠুর লেখাপড়া বন্ধ করেনি। দুজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে যায় মিঠু। সে মহিলা কলেজে বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

অজয় হেসে বলল, আমার ব্যবসা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। এমন তো নয়, ভবিষ্যতে তোকে লটারীর ব্যবসার হাল ধরতে হবে।

— আমি মোটেও অতশত ভেবে বলিনি। মিঠু বলল, আমার কয়েকজন বন্ধু বলছিল তাই!

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। অজয় বলল, চায়ের জল বসা। আজ আবার বাম্পারের টিকিট আনতে শ্যামনগরে যেতে হবে। কপাল জোরে যদি একটা লেগে যায়!

— যেতেই পারে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মিঠু স্বগতোক্তির মতো করে বলল, খদ্দের পয়মন্ত হলে, তার কপালের সঙ্গে তোর কপালও খুলে যেতে পারে।

অনুচ্চ গলায় বললেও মিঠুর কথাগুলি অজয় ভালভাবেই শুনতে পেল। রেগে ওঠার পরিবর্তে সে খুশি হল।

(ছয়)

শম্পা এখন অজয়ের থেকে লটারীর টিকিট কেনে নিয়মিতভাবে। রেজাল্ট মেলাতে আসে। অজয় ঘাড় নেড়ে 'হয়নি' বললেও শম্পা হতাশ হয় না। টেবিল থেকে 'লটারী সংবাদ'-এর সংখ্যাটি তুলে নেয়, আমাকে দেখতে দিন।

অজয় যদি বলে, আমার সব দেখা হয়ে গেছে।

জবাবে শম্পা বলে, আমি যদি ভুল বার করে দিতে পারি?

— সেটা কখনোই হবে না।

— এতটা বিশ্বাস?

— না। তা নয়। অজয় লাজুক গলায় বলে, এই একটা কাজই তো মন দিয়ে করছি। অনেক বছর ধরে।

— মন দিয়ে না ছাই!

— কি বলছেন! অজয় বিস্মিত হয়, আপনি জানেন, সকালে আমার প্রথম কাজ হল রেজাল্ট সিট মেলানো। যদি ছোটখাট কিছু হয়ে থাকে! বড় কিছু হলে তো খেলার দিন রাতেই খবর পেয়ে যাবো। পরদিন দোকান খোলার আগেই লোকের ভিড় জমে যাবে। সেই সময় আপনি এলে, আপনার সঙ্গে কথা বলার ফুরসতও পাবো না।

— সত্যি বলছেন?

জবাব দিতে গিয়ে অজয় থমকে যায়।

অপলক শম্পার মুখের দিকে চেয়ে বলে,

সত্যি যদি এমন কোন দিন আসে, ইশারায় আমি আপনাকে চলে যেতে বলব। কেন জানেন?

শম্পা ঘাড় নাড়ে, না।

— সকলের সামনে আপনার সঙ্গে অন্যরকম কথাগুলো বলতে পারব না। তার চেয়ে বিকেলে আপনার বাড়ি চলে যাবো। বাড়ি চিনে বার করতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

— আমার বাড়ি?

— হ্যাঁ। রাগ করবেন না নিশ্চয়ই। আপনার মুখোমুখি বসে গল্প করব। সেদিন যদি আকাশে বড় করে চাঁদ ওঠে! বা কাছে পিঠে কোথাও বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারণে হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস বয়! আপনাদের বাড়িতে কোন ফুলের গাছ আছে? বেল জুঁই বা মালতী? একটু হাওয়া দিলেই যাদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে? বলুন না?

লম্বা করে শ্বাস ফেলে শম্পা।

আপনার ভাবনার সঙ্গে কিছুই মিলবে না। আমার বাড়ি ঘিঞ্জি মতো জায়গায়। মাটির রাস্তা। কাঁচা নর্দমা। দাওয়া আর একখানা ঘর। এই নিয়ে তো বাড়ি। উঠোন নেই। গাছপালারও কোন প্রশ্ন নেই। তবে হ্যাঁ, চাঁদ উঠলে তার আলো এসে পড়ে দাওয়ায়। ঘরের চালে। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে একটা পুকুর আছে। তার চারপাশে বড় বড় কিছু গাছ আর ঝোপঝাড়। পূর্ণিমার রাতে পুকুরের জল, গাছপালা ঝোপঝাড় রূপোলী আলোয় থইথই করে। বেশ দেখতে লাগে। আবার কেমন ভয়ও করে।

— ভয় কেন? অজয় বলে, আমরা তো ওই পুকুর পাড়ে বসতে পারি। নাকি?

— না, না। পাড়াপ্রতিবেশীরা কি ভাববে!

— ভাবাভাবির কি আছে? মনের কথা বলার জন্যে মনের মতো জায়গা চাই। এই যে এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলি, সে তো কেবল কথার কথা। কেজো কথা। এত লোকের ভিড়, কানফাটানো আওয়াজ, এর মধ্যে কি আসল কথাটি, সত্যি কথাটি বলা যায়!

— আসল কথা! সত্যি কথা!

— হ্যাঁ। আমার তো তাই মনে হয়। যে কথাগুলো কেবলমাত্র আপনার জন্যই, অন্য কাউকে বলা যাবে না। এই পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেগুলি বলতে গেলে আমার জিভ জড়িয়ে যাবে। খেই হারিয়ে ফেলব। কিম্বা এখানে দাঁড়িয়ে সেইসব শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। বক্তৃতার মতো মনে হবে। হয়ত আপনি বিরক্ত হবেন।

শম্পা প্রত্যুত্তর করে না। সংক্ষেপে বলে, আজ চলি।

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে রাস্তা পার হয়ে হাঁটতে শুরু করে।

— মিস দাশ! বলে অজয় হাত তুলে শম্পার উদ্দেশে বলে, শুনুন, আপনি আমায় ভুল বুঝে চলে যাবেন না।

শব্দের বৃষ্টির মধ্যে অজয়ের ডাক শম্পার কানে পৌঁছায় না।

(সাত)

শ্যামনগরে হোলসেলারের ঘর থেকে পুজো বাম্পারের টিকিট নিয়ে এল অজয়। দাম বেশী বলে ইচ্ছেমত টিকিট নিতে পারল না। এ লাইনে ধারবাকির কারবার চলে না। পুরস্কার মূল্য চোখ টাটানো। বাজারে এ টিকিটের চাহিদা থাকবেই।

টিকিটগুলি বাড়ি নিয়ে এসে, অজয় প্রতিবার যেমন করে, ভাউচার থাকা সত্ত্বেও, একটি খাতায় কোন সিরিজের কতগুলি টিকিট নিয়েছে, তার লিস্ট বানিয়ে ফেলল। তার ইনটুইশনে কোন নম্বরগুলির সম্ভাবনা ভাল, তারও একটি তালিকা তৈরী করল অন্য একটি খাতায়। এই দ্বিতীয় খাতাটি সে গোপন একটি জায়গায় রাখে। খেলার ফলাফল ঘোষণার

পর দ্বিতীয় খাতাটি খুলে মিলিয়ে দেখে তার ধারণার সঙ্গে ফলাফলের ফারাকটা বাড়ছে না কমছে।

এবারে সে এই দুটি খাতার বাইরে পুরোনো একটি ডাইরীতে দুটি টিকিটের নম্বর লিখল। এই টিকিটদুটি সে শম্পার জন্য আলাদাভাবে রাখল। সাদা খামে ভরে।

টিকিট কিনতে এসে শম্পা বলল, দুটো টিকিট মানে তো দুশো টাকা। এত টাকা দিয়ে কিনব না।

অজয় বলল, কি বলছেন! যদি লেগে যায়! মিনিমাম প্রাইজ কুড়ি হাজার টাকা।

শম্পা বলল, রিস্ক নিতে পারব না। আপনি বরং অন্য টিকিট দিন। ডেইলি খেলার।

— বিশ্বাস করতে পারছেন না? অজয় বলল, ঠিক আছে। আপনার হয়ে টিকিট দুটো আমিই কিনে রাখলাম।

— আপনার কাছে?

— হ্যাঁ।

— যদি আনএক্সপেকটেড কিছু হয়ে যায়?

— টিকিট তো আপনার।

— স্বীকার করবেন? শম্পা কৌতুকের গলায় বলল, নাকি অত হাজার টাকা হাতে পেয়ে বেমালুম সব ভুলে যাবেন?

— তাহলে টিকিট দুটো আপনার কাছে রাখুন।

— বললাম তো অত টাকা আমার কাছে নেই।

— সেইজন্যেই তো বললাম, আমার কাছে থাক। কিছু না হলে আপনার কাছে দাম ক্লেম করব না।

— আমার জন্য আপনার এতটা ক্ষতি হয়ে যাবে?

— এতটা! বিস্মিত অজয় দুহাত প্রসারিত করে বলল, যদি ভাবেন এতটা, তো এতটাই।

শম্পা হেসে ফেলল। দৈনিক খেলার টিকিট কিনল। যাবার সময় অজয়কে আর একবার স্মরণ করাল, টিকিটদুটো রাখছেন তাহলে?

— নিশ্চয়ই।

— খেলা কবে?

— এ মাসের শেষ দিনে।

— ভাগ্য নির্ধারণ?

— ওই দ্রিনই।

— ভরসা রাখতে পারি?

— আমি তো খদ্দেরদের তাই বলি। অজয় জিভ কেটে হাসল, সবার সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে ফেললাম।

— তাতে কি হলো?

— হলো। অনেক কিছুই হলো।

শম্পা নির্নিমেষ অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে, অজয়ের কেমন অস্বস্তি হল। হেসে বলল, এখন কি সোজা বাড়ি?

··· হ্যাঁ। শম্পা ঘাড় নেড়ে বলল।

(আট)

অজয় নাস্তিক নয়। আবার ঘোরতর আস্তিকও নয়।

কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে গেছে, যার কার্যকারণ মেলাতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে, এর পিছনে অদৃশ্য কোন হাতের খেলা আছে। কে যেন গোড়া থেকে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছিল। অজয়ের হাতে চাবিটি দিয়ে বলল, দুয়ার খুলে দেখে নাও।

উত্তেজনায় অজয়ের মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। তারপরেও সে চেষ্টা করছে আচরণে কথাবার্তায় নিজেকে যথাসম্ভব সহজ স্বাভাবিক রাখতে।

অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করল, টিকিটটা তো তুমিই বেচেছিলে?

জবাবে অজয় ঘাড় দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

— রেগুলার কাস্টমার?

— না!

— একটা সিঙ্গল টিকিট? বাইরের কেউ ...? অবিশ্বাসীর গলায় বলল একজন।

— হতে পারে না? অজয় গলা চড়িয়ে বলল।

— তা পারে। প্রশ্নকর্তা নিজেকে সামলে নেয়, ধরো, তোমার কাছে আর এলই না। সরাসরি হোলসেলারের ঘরে চলে গেল!

— যাক না। হোলসেলার আমার প্রাপ্য আমায় পাঠিয়ে দেবে। শ্যামনগরের ঘোষালবাবুকে সবাই জানে, জেনুইন ভদ্রলোক।

থানার মেজোবাবু কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, তোর একটা টিকিট লেগেছে?

— হ্যাঁ। অজয় বলল, পঞ্চাশ হাজার।

— পঞ্চাশ?

অজয় চুপ করে রইল।

— শালা, আমায় যেগুলো দিলি, তার মধ্যে একটাও লাগল না। কে পেল রে?

— জানি না। আনকমন কোন কাস্টমার হবে।

— পঞ্চাশ হাজার পাবে?

— একটু বাদসাদ যাবে।

— কপাল একেই বলে। তাই না?

— আমিও তো আপনাকে সেই কথাই বলি।

— চোপ। মেজোবাবু ছোট করে ধমকে উঠলেন, তুমি শালা একটা গ্রেট ঢ্যামনা। বিনি পয়সায় বলে, উল্টোপাল্টা টিকিটগুলো আমায় গছিয়েছ।

অজয় হো হো করে হেসে ওঠে।

— হাসছিস কেন?

— আপনি তো নিজেই বেছে নিলেন। একটা দুটো নয়। দশখানা। একটু চুপ করে থেকে বলল, যার লেগেছে, সে হয়ত ওই একটা টিকিটই কেটেছে। বড় জোর দুটো।

(নয়)

বাড়ি ফিরে অজয় কাউকে কিছুই বলল না। চুপিসারে দুটি খাতা এবং পুরোনো একটি ডাইরি নিয়ে ছাদের ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ল। যদিও দুটি টিকিটের নম্বর তার হুবহু মুখস্থ, তা সত্ত্বেও প্রথমে খাতা এবং তারপরে ডাইরির পাতায় লিখে রাখা নম্বরের সঙ্গে টিকিটটি মিলিয়ে নিল। উত্তেজনায় তার আঙ্গুল কাঁপত লাগল। মুখের মধ্যে শুকনো ভাব এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা টের পেল।

কি বলবে শম্পা এবার? সে তো একরকম জোর করেই টিকিট দুটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। তবে কি এটা তার হাতযশ!

শম্পা হয়ত বিশ্বাসই করবে না। তারপর যখন দেখবে একশ টাকার একটি টিকিটের বিনিময়ে সত্যি সত্যি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে এবং অজয় তার প্রতিশ্রুতিমত টিকিটটি শম্পার হাতে তুলে দিতে এসেছে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে পারে বা অজয়ের সততায় মুগ্ধ হয়ে বলে ফেলতে পারে, এতদিন কোথায় ছিলেন!

অজয় কি ছাই বুঝতে পেরেছিল, ক্রেতা বিক্রেতার সীমানা টপকে একটি নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, তার আর শম্পার মধ্যে। অজয় স্থির বিশ্বাসী, সে যেমন, শম্পাও তেমনি, অজয়ের দুঃখে কাতর হয়। অজয়ের সুখকে নিজের ভেবে তার ভাগ নিতে চায়।

সন্ধ্যের মুখে অজয় সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মাকে বলে গেল, একজনের বাড়ি যাচ্ছি। দেরী হলে ভাববে না।

জি.টি.রোড ধরে সামান্য এগিয়ে অজয় ধরমপুরের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। ছোট মুদীর দোকানীকে জিজ্ঞেস করে শম্পার বাড়ির অবস্থান জেনে নিল। খেলার মাঠের গা ঘেঁসে অল্প একটু এগিয়ে অজয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামান্য দূরেই সে শম্পাকে দেখতে পেল। ছোট ছোট পা ফেলে আনমনার মতো হেঁটে আসছে। সাইকেল থেকে নেমে পড়ে অজয় অকারণেই ঘণ্টি বাজাল ক্রিং ক্রিং করে।

ঘণ্টির আওয়াজে মাথা তুলে তাকাল শম্পা এবং অজয়কে দেখে চমকে উঠল, আপনি?

— খুব অবাক হয়ে গেছেন, না?

— স্বাভাবিক।

— একটা দারুণ খবর। চলুন আপনার বাড়ি গিয়ে বলব।

— আমার বাড়ি? শম্পা ইতস্তত করল।

— আরও ভেতরে বুঝি?

— না। তা নয়।

— তাহলে?

— মায়ের শরীর খারাপ। মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, বাড়ি বলতে তো একটাই ঘর।

—আপনি যে বলেছিলেন দাওয়া আছে?

— সেখানে ভাই পড়ছে। টেস্ট পরীক্ষা চলছে কিনা।

অজয় প্রথমে চিন্তিত গলায় বলল, তাহলে? পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল, খবরটা দারুণ। আপনার ভাষায় আনএক্সপেকটেড। কিম্বা বলতে পারেন আমার হাতযশ।

শম্পা হেসে বলল, আপনি এমন ছেলেমানুষের মতো করছেন! খবরটা কি বলবেন তো?

— এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। কোথাও একটা বসতে হবে।

এদিক ওদিক চেয়ে অজয় বলল, আপনি বলেছিলেন না, আপনার বাড়ির পিছনে একটা পুকুর আছে। তার পাড়ে বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড় ...!

— ওই তো পুকুরটা। শম্পা আঙ্গুল তুলে দেখাল, দেখতে পাচ্ছেন? বসবেন ওখানে? চলুন।

— পাড়া প্রতিবেশীরা আবার কিছু ভাববে না তো?

— ওটা আপনাকে এমনি বলেছিলাম। শম্পা নিজেই অজয়ের সাইকেলের হ্যান্ডেলটি ঘুরিয়ে দিল, চলুন।

(দশ)

বেশ অনেকটা সময় হয়ে গেল, অজয় এবং শম্পা পুকুরের কোল ঘেঁসে বড় ঝাঁকড়া একটা গাছের নীচে পাশাপাশি বসে আছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে জোনাকী জ্বলছে টিপ টিপ করে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে গিরগিটি বা বড় মাপের কোন পোকা ছুটে যাওয়ার জন্য থেকে থেকেই গা ছমছমে শব্দ তৈরী হচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ক্ষয়াটে আলোয় অদ্ভুত আলো আঁধারীর আবহ তৈরী হয়েছে।

ধারণাতীত ভাবে লটারীর টিকিট মিলে যাওয়া এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির গল্প অজয় বলেছে। অজয়ের বলার মধ্যে আবেগ ছিল। আনন্দের আতিশয্যে বেশ কয়েকবার একই শব্দ একাধিকবার বলেছে। প্রত্যেকবার শম্পার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে অধীর আগ্রহে।

আশ্চর্য, সব কিছু শোনার পরেও শম্পার চোখমুখের চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটেনি। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে একই ভঙ্গিতে বসে।

খামে ভরা টিকিটটা অজয় শম্পার দিকে বাড়িয়ে ধরল, টিকিটটা আপনার কাছে রাখুন।

শম্পা মাথা নাড়ল, উঁহু। ওটা আপনার কাছেই রাখুন। আপনার খুব আনন্দ হয়েছে, তাই না?

— নিশ্চয়ই। অজয় বলল, আপনি খুশি হননি?

শম্পা শব্দ করে শ্বাস ফেলল, আপনি খুব ভালমানুষ। কথার খেলাপ তো করতেই পারতেন। পারতেন না?

— না। তা কেন হবে?

— হতেই পারত। এর চেয়েও কত নীরেট প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে যায়।

— আমি আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

— সত্যি বলব? শম্পা করুণ গলায় বলল, টাকাটা আমার খুব দরকারে লাগবে। বিশ্বাস করুন।

শম্পার বলার ধরণে অজয় চমকে উঠল, কেন? কোন বিপদ আপদ ...?

— না। তার চেয়েও অনেক বড় প্রয়োজনে টাকাটা লাগতে পারে। শম্পা বলল, ওই টাকাটা দিয়ে সুদীপ একটা ব্যবসা শুরু করতে পারে। বেচারী প্রতিবন্ধী। শরীরের জন্য বেশী লেখাপড়াও করতে পারেনি। আর্থিক অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।

— সুদীপ? অজয় চমকে উঠল, সুদীপ কে? আপনার আত্মীয়? না পরিচিত?

শম্পা সোজা চোখে অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে, সুদীপ? বলে অল্পক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আস্তে আস্তে চোখ দুটি বন্ধ করল, ওকে ঘিরেই যে আমার সব। সব কিছু।

– সব মানে? অদ্ভুত গলায় অজয় জিজ্ঞেস করল।

শম্পা হাসল। কোন জবাব দিল না।

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে শম্পা বসে রয়েছে। এখন তার চোখ দুটি খোলা। দৃষ্টিতে উদাস ভাব।

অজয়ের মনের মধ্যে ঝড় বইছে। নিপুণভাবে বোনা একটি স্বপ্ন, শম্পার সম্মতির অপেক্ষায় যা ছিল উদগ্রীব, এক হ্যাঁচকায় শম্পা তা নিজেই ছিঁড়ে দিয়েছে।

কি করবে অজয় এখন? চীৎকার করে বলবে, আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। সে বড় হাস্যকর একপেশে ব্যাপার হবে। অজয়ের মনে হল। তার চেয়ে হাতে ধরা টিকিটটি জামার পকেটে ভরে নিয়ে, নিঃশব্দে ফিরে যাওয়াটাই মানানসই এবং যথাযথ হবে।

অজয় উঠে দাঁড়াল। অস্ফুটে বলল, চলি।

আসুন। অজয়ের দিকে না ফিরেই শম্পা বলল।

সাইকেলে উঠতে গিয়ে কি মনে করে অজয় পিছন ফিরে তাকাল। নীরেট নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃসঙ্গ শম্পা বড় একটি গাছের নীচে বসে। চারপাশে কেউ নেই।

সামান্য দূর থেকে শম্পাকে এক অলৌকিক নারীর মতো দেখাচ্ছে। এ যেন অন্য এক শম্পা। কোনরকম প্রগলভতা নেই। অর্থ তার জীবনের বুনিয়াদ গড়ে দিতে পারে জেনেও, সে অর্থকে হেলায় ফিরিয়ে দিচ্ছে।

অজয়ের মনে হল এ শম্পাকে সে চেনে না। আর চেনে না বলেই, এই অপরিচিতার কাছে সে হারতেও পারে না।

তার শরীরের মধ্যে অদ্ভুত এক আলোড়ন তৈরী হল। যেন মাথায় বৃষ্টিভরা মেঘের ছোঁয়া লাগছে। হাতদুটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

পিছন ফিরে বসে থাকা শম্পার উদ্দেশে বলল, আগামীকাল হোলসেলারের কাছে যাব। একান্ত কাল রাতে না হলে, পরশু সকালে অবশ্যই টাকাটা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

(এগার)

জি.টি.রোডে উঠে একটা সিগারেট ধরাল অজয়। রবীন্দ্র নগর, হুগলী মোড় পেরিয়ে গেল। অজয় সাইকেল চালাচ্ছে। রাস্তার দুপাশ ফাঁকা। বিস্তীর্ণ নীচু জলা জমি। তার মাঝেই দুচার ঘর মানুষের বসতি। টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

কতদূর যাবে অজয়, নিজেও জানে না। মাকে বলে এসেছে, ফিরতে দেরী হবে।

সুদীপ কে? শম্পা যেমন বলল খুব গরীব, কম লেখাপড়া জানা, প্রতিবন্ধী একজন

যুবক? লটারীর পাওনা টাকায় ব্যবসা শুরু করবে? তারপর শম্পাকে সঙ্গী করে ...! অজয়ের রাগ হচ্ছে না। নিজেকে নির্বোধও ভাবছে না। পরিবর্তে অন্যরকম তৃপ্তি বোধ করছে।

অসহায় প্রতিবন্ধী একটি যুবক, হেরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারবে।

কেউ জানতেও পারবে না এ সবের পিছনে অজয়ের ভূমিকা কতখানি!

— না জানুক। নিজেকেই বলল অজয়, চালচুলোহীন লটারীওলা, তুমি কি নিজেও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলে, ভেঙ্গে পড়া নুইয়ে পড়া একটি জীবনকে, আর পাঁচটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনস্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে! এতটা ক্ষমতা তোমার নিজের মধ্যে ছিল!

ফাঁকা রাস্তায় একা সাইকেল চালাচ্ছে অজয়। যেন সে নিরুদ্দেশের যাত্রা শুরু করেছে। তার দু চোখ খোলা। উৎকর্ণ দু কান।

যদি অন্য কোন শম্পা ক্ষীণ গলায় তাকে ডাকে, এই যে শুনছেন?